সাতদিন

২৪ সেপ্টেম্বর: ফেনীর সোনাগাজীতে সন্ত্রাসী হামলায় ছাত্রলীগ নেতা নিহত এবং থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৬ জন আহত।

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শামীম ওসমানের গাড়ির বহর থেকে সন্ত্রাসীসহ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার।

২৫ সেপ্টেম্বর : খালেদা জিয়ার নির্বাচনী জনসভা কেন্দ্রিক দুটি দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত ও ৯০ জন আহত হয়েছেন।

ফেনী, ময়মনসিংহ, মুন্সিগঞ্জ ও দাউদকান্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ১০ জন নিহত হয়েছেন।

বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক সমর দাস (৭২) ইন্তেকাল করেছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর : সুনামগঞ্জে আওয়ামী প্রার্থী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সভার কাছে বোমা বিস্ফোরণে ৪ জন নিহত।

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে নির্বাচন কমিশন ৪১ জন প্রার্থীকে নোটিশ প্রদান করেছেন।

২৭ সেপ্টেম্বর : নির্বাচনী সংঘর্ষে জমালপুর, কুমিল্লা ও খাগড়াছড়িতে ৩ জন নিহত।

নারায়ণগঞ্জে জেলা ছাত্রদল সভাপতি অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার।

২৮ সেপ্টেম্বর : পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী জনসভা সম্পন্ন।

কক্সবাজার-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী খালেকুজ্জামান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

২৯ সেপ্টেম্বর: নয়াপল্টনে বিএনপি'র শেষ নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত।

নির্বাচনী সহিংসতায় ভোলা, মুন্সিগঞ্জ, রাজশাহী, সিলেট , সোনাগাজী, মৌলভীবাজারে প্রায় ৭ জন নিহত।

৩০ সেপ্টেম্বর : নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন শেখ হাসিনাসহ ৫৪ জনকে সতর্ক করে দিয়েছে।

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান সকল রাজনৈতিক দলকে হাসিমুখে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়ার আহবান জানান।

গণতন্ত্রের পথে আরেক ধাপ

'৯০-এবং '৯৬-এর পর আবারো বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছে। এই পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এতে এই সরকারের ন্যায্যতা যেমন প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতি জনগণের রায়ও প্রতিফলিত হয়েছে ...লিখেছেন **আসিফ নজরুল**

শেখ হাসিনাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কতটা আসনে জিতবেন বলে আশা করছেন? উত্তর দিতে গিয়ে তিনি প্রথমে বললেন একশ... বলে একটু ভাবলেন তারপর বললেন ৮০টি। অনেকে মনে করলেন তিনি ১০০ বা ৮০ বুঝাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছিলেন একশ' আশিটি।

নীরব এবং নজিরবিহীন একটি ভোট বিপ্লব ঘটে গেছে বাংলাদেশে এবারের সংসদ নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বলা তিনটি অঙ্ক ৮০, ১০০ বা ১৮০-র কোনোটি মিলছে না হিসাবে। তার হিসাব বিরোধী দলের কেউ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সম্ভবত কেউই ভাবতে পারেনি আওয়ামী লীগ খুব একটা কম আসন পাবে। সবচেয়ে রক্ষণশীল হিসেবেও আওয়ামী লীগ অন্তত ১০০টি আসন পাবে তা ধরেই নেয়া হয়েছিল।

এই ফলাফল বিস্ময়কর, অভাবিত, বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নজিরবিহীন। বাংলাদেশে কখনোই ক্ষমতা ছেড়ে আসা দলকে এমন করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়নি জনগণের রায়ে। তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরীর মতো আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এবার পরাজিত হয়েছেন। পরাজিত হয়েছেন প্রায় দুই ডজন মন্ত্রী। কারো কারো পরাজয় গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতি হয়েছে বলে

অনেকে দুঃখিত। কিন্তু সবাই আনন্দিত। জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে জয়নাল হাজারী, হাজী সেলিম, শামীম ওসমান, হাজী মকবুল, এইচ.বি.এম ইকবাল, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্‌র মতো সন্ত্রাসী গডফাদারদের। এদেরকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সমর্থন জুগিয়েছেন স্বয়ং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নিজেও হেরে গেছেন একটি আসনে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সীমাহীন সন্ত্রাসকেই দলের পরাজয়ের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই সময়ে ৩৭ হাজার লোক সন্ত্রাসের বলি হয়েছে, জনসভায়/অনুষ্ঠানে একের পর এক রহস্যজনক বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে, রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে দখল করা হয়েছে হাট- মাঠ, নদী-বন্দর, সরকারি ভবন। আইন প্রণেতা নেমেছে আইন ভঙ্গের প্রতিযোগিতায়। আইনের বিধান নয়, সন্ত্রাসীর ভাষা আর অভিব্যক্তিই শাসন করেছে সাধারণ জনগণকে। এবারের নির্বাচনে জনগণ বিশেষ করে নারীসমাজ ম্যান্ডেট দিয়েছে সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

অভিবাদন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদকে। আর আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত নিরাপত্তা সদস্যদের। জনগণের রায় দেবার অধিকারকে তারা নিশ্চিত করেছেন

এবারে যে বিপুল সংখ্যক নতুন প্রজন্মের ভোটার ভোট দিয়েছে, সন্ত্রাস আর দুর্নীতির বলি হয়েছে তারাও। আওয়ামী লীগ শাসনামলে এদের কর্মসংস্থান হয়নি। প্রথমেই শেয়ার মার্কেটে ধস নেমেছে, এদেরই ছোট ভাই-বোনরা পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছে, রাস্তাঘাটে প্রতিদিন নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়েছে। এর জন্যে মানুষের সব আশীর্বাদ অর্পিত হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর।

এবারের নির্বাচনে বিএনপির বিশাল বিজয় তাই যতটা না দলটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছে, তারচেয়ে বেশি প্রতিফলিত করেছে সন্ত্রাস, দুর্নীতি আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যাখ্যানকে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসে বিএনপিকে তাই খুব দায়িত্বশীলভাবে সরকার পরিচালনা করতে হবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটি দলকে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। বিএনপি এই প্রলোভন দমন করলেই এবারের নির্বাচনের সুফল সাধারণ জনগণ ভোগ করতে পারবে।

দুটো প্রধান দলকেই মনে রাখতে হবে নির্বাচন শুধু জয়-পরাজয় নির্ধারণের বিষয় নয়। নির্বাচন সরকার এবং বিরোধী দলের দায়িত্ব নির্ধারণে জনগণের রায় প্রকাশও। এই দায়িত্ব দু'পক্ষই সঠিকভাবে পালন না করতে পারলে যতো সুষ্ঠুভাবেই নির্বাচন হোক না কেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত কখনোই সুশক্ত হবে না।

বিএনপি বিজয়ী হয়েছে। বিএনপি নেত্রী সুবচন, ভব্যতা আর সুশীল সমাজের কথা বলেছেন। প্রতিহিংসা আর অতীতচর্চা ভুলে সামনের দিকে এগুনোর কথা বলেছেন। দেশের মানুষের এখন প্রত্যাশা এটিই।

সুষ্ঠু ও অবাধ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন। অভিনন্দন সশস্ত্র বাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের। অভিনন্দন দেশের মানুষকে যারা তাদের ভোট প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করেছেন নির্ভীকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

‘নৌকার জোয়ার, তাই বিএনপির পোলিং এজেন্টরা কেন্দ্রে আসেনি’

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া

পুকুর থেকে ব্যালট বাক্স তুলে নিয়ে আসছে পুলিশ

চাঁদপুর-২ আসন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোফাজ্জল হোসেন মায়া চৌধুরী। নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই তিনি নিজের এলাকা এখলাসপুর-মোহনপুর ইউনিয়নের কেন্দ্রগুলো একের পর এক দখল করে নেন। বেলা ১২টার মধ্যে মায়া চৌধুরীর এলাকার কেন্দ্রগুলোতে প্রায় ৮০ ভাগ ভোট পড়ে। কিন্তু এরপর তার এলাকায় অধিকাংশ কেন্দ্র আওয়ামী লীগ কর্মী ছাড়া জনশূন্য হয়ে পড়ে। শুরু হয় জাল ভোটের আয়োজন। নির্বাচনের দিন মায়া চৌধুরীর এলাকায় কেন্দ্রগুলোতে কোনো হাঙ্গামা না হলেও চাঁদপুর জেলার এই আসনটির বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বাতিল হয়ে যায় ৮টি কেন্দ্র।

ফরাজিকান্দি ইউনিয়নের আলীয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রটি সর্ব প্রথম মায়া চৌধুরীর হামলায় শিকার হয়। সকাল ১০টার দিকে মায়া তার দলীয় সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ফরাজিকান্দি ইউনিয়নের আলীয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রটিতে হামলা চালায়। হামলায় উক্ত ইউনিয়নের বিএনপি সভাপতি আখতার হোসেনসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, ‘গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে মায়া কেন্দ্রটি দখল করতে না পেরে ভোটারদের প্রতি নিজ হাতে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেন। গুলির শব্দে ভোটারে পূর্ণ কেন্দ্রটিতে চরম আতঙ্ক আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। মায়ার লোকজন বেশ কয়েকটি ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে বাক্সগুলো পুলিশ পার্শবর্তী পুকুর হতে উদ্ধার করে।’ নৌকার জোয়ার, তাই বিএনপি পোলিং এজেন্টরা কেন্দ্রে আসেনি। তারা জানে নৌকা বিপুল ভোটে পাস করবে। কেন্দ্র বাতিল করা সম্পর্কে তিনি বলেন, কেন্দ্রগুলোতে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যার জন্য কেন্দ্র বাতিল করতে হয়।’

বিএনপি সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। মায়ার ক্যাডার বাহিনী আইসি ডিডিআরবি-এর কর্মচারী লুৎফা বেগমকে তার বাড়ির আঙ্গিনায় বেধড়ক মারপিট করে বলে এলাকাবাসী জানায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্রটি বাতিল করে দেয়। বেলা ১২টায় ছেংগারচর ইউনিয়নের সেঙ্গারচর কলেজ (মহিলা কেন্দ্র) তার হামলার শিকার হয়। কেন্দ্রটিতে তিনি পৌঁছে মহিলাদের মধ্যে চলে যান। মায়া চৌধুরীর আগমন দেখে মহিলারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। মহিলারা মায়া চৌধুরী যতক্ষণ কেন্দ্র না ত্যাগ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভোটদানে

১টি আসন আওয়ামী লীগের

বিএনপি ও তার শরিক দলের অভাবনীয় সাফল্য আর আওয়ামী লীগের ভয়াবহ বিপর্যয়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। জানার চেষ্টা করছেন কেন এমন হলো? এ ক্ষেত্রে তারা প্রথম যে দুটি কারণকে চিহ্নিত করছেন তাহলো– চারদলীয় জোটের ঐক্য এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। জোটের ভোট ৫টি আসনে বিভক্ত হয়ে না যাওয়ায় সহজে জিতেছেন তাদের প্রার্থীরা। আবার ঐ ৫টি আসনেই প্রচন্ড কোন্দল ছিল আওয়ামী লীগে...

আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত যশোরে যে বিএনপি এবার আঘাত হানবে এমন আশংকা ছিল নির্বাচনী তফশিল ঘোষণার পর থেকেই। কিন্তু সে আঘাতে আওয়ামী লীগের ঘাঁটি যে ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে তেমনটি কেউ কল্পনাও করেননি। রাজনৈতিক বোদ্ধাদের ধারণা ছিল অন্তত গোটা দু’য়েক আসন এবার আওয়ামী লীগের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তার চেয়েও ভয়ংকর ফলাফল হয়েছে। দু’একটি নয়, পাঁচ পাঁচটি আসন হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদের। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। সম্ভবত এই আসনে জোটের ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় বেঁচে গেছেন তিনি। জয়পরাজয়ের ব্যবধান মাত্র ১৬২ ভোট।

যশোর-১ (শার্শা) আসনে আওয়ামী লীগের এবার প্রার্থী ছিলেন দেশের শীর্ষ ধনাঢ্য বক্তি শেখ আকিজ উদ্দিনের ছোট ছেলে শেখ আফিল উদ্দিন। বার্ধক্যজনিত কারণে সাবেক সাংসদ তবিবুর রহমান সরদার এবার মনোনয়ন পাননি। গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় শার্শা এলাকায় আকিজ শিল্পগোষ্ঠী যে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে ছিল তা ছিল প্রশংসনীয়। তাছাড়া আকিজ পরিবারের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে শার্শায়। পাশাপাশি এখানে বিএনপির মধ্যেও ছিল চরম দ্বন্দ্ব। যে কারণে এ আসনটি নিয়ে খুব আশাবাদী ছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু সে আশা দুরাশায় পরিণত করে দিয়েছেন এ আসনের চারদলীয় জোট প্রার্থী বিএনপির প্রবীণ নেতা আলী কদর। ১২ হাজারের বেশি ভোটে তিনি হারিয়ে দিয়েছেন আফিল উদ্দিনকে। তিনি পেয়েছেন ৮৬ হাজার ৫৮৩ ভোট আর আফিল উদ্দিন পেয়েছেন ৭৪ হাজার ১৩২ ভোট। অথচ আলী কদর এই আসনে প্রথমে

হামলার শিকার ভোট কেন্দ্র

অস্বীকৃতি জানালে, মায়া মহিলাদের ওপর চড়াও হন। ছেংগারচর পৌরসভা চেয়ারম্যান আমেনা খাতুন কেন্দ্রে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে মায়া তাকে গালিগালাজ করে লাঞ্ছনা করেন। মায়ার এই ধরনের আচরণে ছেংগারচর ইউনিয়নের বিএনপির সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। লাঠিসোটা নিয়ে বিএনপি ও আওয়ামী সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয় টিএনও অফিস। টিএনও আব্দুর রহিম জানান, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে সেই মুহূর্তে টিএনও অফিসে লোকজনদের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পৌরসভা চেয়ারম্যান আমেনা খাতুন জানান, যে কেন্দ্রগুলোতে বিএনপি প্রার্থী নুরুল হুদার ভোট বেশি তার অধিকাংশ মায়া প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়।

বাতিল হয়ে যাওয়া চর মাসুয়ার ৮নং কেন্দ্রটিতে মায়া চৌধুরী ডান হাত হিসেবে পরিচিত মঞ্জু সকাল থেকেই মহিলা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। মহিলাদের দিয়ে আওয়ামী লীগে ভোট দেয়াতে না পেরে তিনি মহিলাদের ওপর চড়াও হন। মহিলাদের মারধর, শাড়ি খুলে ফেলার ঘটনাও ঘটে কেন্দ্রটিতে। তিনি মহিলাদের হাত থেকে ব্যালট পেপার কেড়ে নেন। কেন্দ্রটির প্রিজাইডিং অফিসার মোল্লা শহিদুল ইসলাম জানান, এলাকার প্রভাবশালী মঞ্জু গ্রুপের পুরুষ ভোটার এই মহিলা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছে। সকাল থেকেই দুই তিন দফা সংঘর্ষ হওয়ায় তিনি কেন্দ্রটি বাতিল করতে বাধ্য হন।

মাথাভাঙ্গা ইউনিয়ন থেকে সানকিভাঙ্গা ইউনিয়ন পর্যন্ত মোবাইল পুলিশের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ অফিসার ফিরোজ তিনি জানান, এলাকাবাসীর কাছ থেকে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, সানকিভাঙ্গা ও জয়পুরের যে দুটি কেন্দ্র স্থগিত হয়েছে তার পেছনে মায়া চৌধুরীর লোকজনের হাঙ্গামাই মূল কারণ।

আহত বিএনপির নেতা

বেলা ২টায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধি মায়া চৌধুরীর এলাকা এখলাসপুর ইউনিয়নে পৌঁছে দেখে ঐ ইউনিয়নের কোনো কেন্দ্রেই জোট প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট নেই। অন্যান্য দলের এজেন্টদের কাছে চার দলীয় জোটের পোলিং এজেন্ট সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত পাওয়া যায়। একই কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথের পোলিং এজেন্টরা বিভিন্ন কথা বলেন। কেউ বলেন সকাল থেকেই তারা আসেনি। আবার কারো মতামত, ভাত খেতে গেছে, বাথরুমে গেছে। একই ঘটনা ঘটেছে মোহনপুর ইউনিয়নে। এই ইউনিয়নে মায়া চৌধুরীর নিজ বাড়ি থাকায় এখানে তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাব খাটিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল গনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'কেন্দ্রটিতে বেলা ১২টা পরে কোনো ভোটার দেখা যায়নি কিন্তু ৪টার মধ্যে কিভাবে ৮৫ ভাগ ভোট হয়ে যায়।' তিনি জানান, এই এলাকার সবগুলো কেন্দ্রে মায়ার নিজস্ব লোক থাকায় এ এলাকার কেন্দ্রগুলোতে মায়া ও তার লোকজন ব্যাপক প্রভাব চালায়।

সন্ধার আগে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে মায়া চৌধুরী পরাজিত হবার কথা শুনে হেংগারচর ইউনিয়নের অধিকাংশ লোকের মুখে শোনা যায় একই কথা। 'গতবার তার আসনের সব ভোট সে একাই দিয়েছে আর এবার আমরা সবাই দিয়েছি।'

চাঁদপুর থেকে ফিরে লিখেছেন... **আসাদুর রহমান,** ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

মনোনয়নই পাননি। তারেক জিয়ার লবিংয়ে এ আসনে মনোয়নয়ন পেয়েছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় তরুণ নেতা মফিকুল হাসান তৃপ্তি। দলের এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে আলী কদর স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলেন। এবং তার-কর্মী সমর্থকরা তৃপ্তিকে বেদম প্রহার করে পাঠিয়েছিল হাসপাতালে। এ ঘটনায় শার্শা থানায় জননিরাপত্তা আইনে মামলা হলে পুলিশ কদরসহ তার বেশ ক'জন কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠায়। পরিস্থিতিগত কারণে দল শেষ পর্যন্ত আলী কদরকেই প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পান। ছিনিয়ে আনেন বিজয়ের মালা।

যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে জিতেছেন জোটের প্রার্থী ও জামায়াত নেতা আবু সাঈদ মোহাম্মদ শাহাদত হোসাইন। তিনি হারিয়ে দিয়েছেন সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে। অনেকটা অভাবনীয় ফলাফল হয়েছে এ আসনে। ঝিকরগাছার জনপ্রিয় নেতা সদালাপী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে তিনি হারিয়ে দিয়েছেন প্রায় ১৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭২৭ ভোট। আর অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৮শ' ৮ ভোট।

যশোর-৩ (সদর) আসনে গতবার আওয়ামী লীগের প্রার্থী আলী রেজা রাজু ১০ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন বিএনপি প্রার্থী তরিকুল ইসলামকে। কিন্তু এবার সেই তরিকুল ইসলামের কাছেই তিনি হেরে গেছেন প্রায় ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে। তারা ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৪৪ ও ১ লাখ ৮ হাজার ১১১ ভোট। এই আসনের অপর আলোচিত প্রার্থী আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ ভোট পেয়েছেন মাত্র ২০ হাজার ৪শ' ৮৫টি। যশোরে প্রচার রয়েছে, ভোটে জেতার জন্যে অন্তত তিনি ৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন। সে হিসাবে প্রতিটি ভোটের জন্যে তার ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫শ' টাকা। এ আসনে প্রার্থী না হয়েও নির্বাচনে আরেক জনের ভরাভুবি হয়েছে, তিনি হলেন সাবেক মন্ত্রী খালেদুর রহমান টিটো। যশোর-৩ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন না পেয়ে দল থেকে পদত্যাগ করে তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তরিকুলকে হারানোর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে তিনি জনসভা করে আলী রেজা রাজুর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু রাজুর পাশাপাশি তারও ভরাভুবি হয়েছে।

যশোর-৪ (অভয়নগর-বাঘারপাড়া) আসনে জিতেছেন জোটের প্রার্থী জাপা (না-ফি) নেতা এমএম আমীন উদ্দিন। আর হেরে গেছেন সাবেক এমপি শাহ হাদিউজ্জামান। আমিন উদ্দিন ১ লাখ ২৬ হাজার ৫৩৯ এবং হাদিউজ্জামান ১ লাখ ১ হাজার ৮২৫ ভোট পেয়েছেন। এ আসনটি নিয়েও আওয়ামী লীগ খুব আশাবাদী ছিল। কারণ গতবার দ্বিতীয় স্থানে থাকা আমীন উদ্দিন সেবার ছিলেন

স্পট: খুলনা

বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ

সকাল সাড়ে সাতটা। দুই ঘন্টা ধরে খুলনা জেলা স্কুলের মাঠে ভোটারদের লক্ষ্য করছি। এমন সময় Hello, Good Mornign বলে হাত বাড়িয়ে বললেন I`m Theresa Fallot from European Union. অমায়িক ও বাকপটু এই মধ্যবয়স্কা ফরাসির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো। নিজের দেশের নির্বাচনের শৃঙ্খলার সাথে তুলনা করে বলেন, এখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি, সবাই আসার কোনো উপায় নেই। এত ভোটার এক সাথে দেখে তিনি বেশ বিস্মিত হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, ঠিক হয়ে যাবে, ভয় পেয়ো না। এক মাসের বেশি সময় ধরে তিনি খুলনায় অবস্থান করছেন। খুলনা খুব সহজেই তাকে আপন করে নিয়েছে। ফালুদা, ডাবের পানি লুইসকে ছেড়ে যেতে হবে এটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে তার। ফরাসি যুবক লুইস সুন্দরবন বায়োডায়ভার্সিটি প্রজেক্টে কাজ করেন। স্থানীয় প্রশাসনের যথাযথ সহযোগিতা পাননি বলে অভিযোগ করলেন। পুলিশ বাহিনীর প্রশংসা করলেন। রাজনীতিবিদদের মানসিকতা নিয়ে তিনি হতাশা প্রকাশ করলেন। বললেন, প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজেদেরকে দেশের প্রেসিডেন্টের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সকাল ১০টার দিকে গেলাম ন্যাশনাল বয়েজ নৈশ বিদ্যালয় কেন্দ্রে। সবকিছু সুন্দরভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তেমন কোনো ভিড় নেই, সুন্দরভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। তবে অল্প বয়সী অনেক ভোটার চোখে পড়লো। মহিলা লাইনে বোরকা পরা বৃদ্ধা তালিকায় নিজের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না।

প্রিজাইডিং অফিসার ব্যস্ত অন্য সব জিনিসপত্র বুঝে নিতে। বিএনপি'র পোলিং এজেন্ট উজ্জ্বল জানালো, তার বুথে ৮০% ভোট পড়েছে। সবার হাত দ্রুত চলছে। সারিবদ্ধভাবে সিলমারা ব্যালটপেপার সাজানো হচ্ছে। আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট লাবু জানালেন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ছাড়া অন্য মার্কায় তেমন ভোট পড়বে না। হঠাৎ একটি ব্যালট পাওয়া গেলো ঘড়ি মার্কায় সিল দেওয়া। ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে কার কাছে ঘড়ি? কেউ উত্তর দেয় না। অর্থাৎ এটাই প্রথম। অন্যরা বলে, মার্কার ওপর সিল আছে তো, ওতেই চলবে। একটা পাওয়া গেল তাতে কোনো সিল মারা নেই। পোলিং অফিসার মিরাজ আহম্মেদ বললেন বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, সবাইকেই খুশি করেছে। সবার হাত ঘোরাঘুরি করে নৌকার সিল পড়াগুলো এক জায়গায়, ধানের শীষগুলো অন্য জায়গায় জমা হচ্ছে। ধানের শীষের ব্যালট গোনা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট সতর্ক দৃষ্টিতে গণনা দেখছেন। ৫৫,৫৬,৫৭,৫৮,৫৯,৬০,৬১, দাঁড়ান ঐটার কি অবস্থা, আপত্তি আছে। খুব

খুলনায় ভোট দিচ্ছে ভোটাররা

ঐক্যবদ্ধ জাপার প্রার্থী। এবার তিনি জাপা-(না-ফি)র নেতা হিসেবে চারদলীয় জোটের প্রার্থী হন। তাকে প্রার্থী করায় বিএনপি'র মধ্যেও ক্ষোভ ছিল। কিন্তু নির্বাচনে তার প্রভাব না পড়ায় আওয়ামী লীগের আশা পূরণ হয়নি।

যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে জিতেছেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও জোটের প্রার্থী মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস। তিনি হারিয়ে দিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সবচেয়ে কৌশলী নেতা সাবেক এমপি খান টিপু সুলতানকে। তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা যথাক্রমে ১ লাখ ১০ হাজার ৮৩৫ ও ৮৯ হাজার ৭৮৪ ভোট। স্থানীয় আওয়ামী লীগের কোন্দল দমন করতে পারলেও টিপু সুলতান শেষ পর্যন্ত তার পরাজয় রোধ করতে পারেননি। আওয়ামী লীগের দুর্গ থেকে রাতারাতি বিএনপি'র নতুন ঘাঁটিতে পরিণত হওয়া যশোরে এখন যে স্থানটিতে নৌকার বৈঠা উঁচু হয়ে আছে তাহলো যশোর-৬। অনেকটা ভাগ্যের জোরে এ আসনে জিতে গেছেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। তিনি হারিয়ে দিয়েছেন বিএনপি'র বিদ্রোহী প্রার্থী (বহিষ্কৃত) মাওলানা শাখাওয়াত হোসেনকে। তারা ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ৫৭ হাজার ৪৫৬ ও ৫৭ হাজার ২৯৪। এ আসনের চারদলীয় জোট প্রার্থী জামায়াত নেতা এনামুল হক খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। তবে জোটের ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় পাস করে গেছেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এটা নিশ্চিত।

বিএনপি ও তার শরিক দলের অভাবনীয় সাফল্য আর আওয়ামী লীগের ভয়াবহ বিপর্যয়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। জানার চেষ্টা করছেন কেন এমন হলো? এ ক্ষেত্রে তারা প্রথম যে দুটি কারণকে চিহ্নিত করছেন তাহলো– চারদলীয় জোটের ঐক্য এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। জোটের ভোট ৫টি আসনে বিভক্ত হয়ে না যাওয়ায় সহজে জিতেছেন তাদের প্রার্থীরা। আবার ঐ ৫টি আসনেই প্রচন্ড কোন্দল ছিল আওয়ামী লীগে।

যশোর-১ আসনে আব্দুল হক গ্রুপ, ২ আসনে আতিউর রহমান, ৩ আসনে জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদকসহ শীর্ষ পর্যায়ের সিংহভাগ নেতা, ৪ আসনে বীর প্রতীক ইসহক ও ৫ আসনে পিযুষকান্তি ভট্টাচার্য গ্রুপ প্রকাশ্যে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত দলীয় প্রধানের নির্দেশে নমনীয় হলেও বাস্তবে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেনি। অভ্যন্তরীণ কোন্দল আওয়ামী লীগকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যা ছিল না জোটের মধ্যে। প্রার্থিতা নিয়ে কোথাও কোথাও ক্ষোভ-বিক্ষোভ হলেও তার প্রভাব পড়েনি নির্বাচনে। আওয়ামী লীগকে হটাতে তারা ক্ষোভ ভুলে ভোট দিয়েছে জোটের প্রার্থীকে। যার প্রমাণ যশোর-৬ আসন। এখানে আওয়ামী লীগে তেমন কোনো দ্বন্দ্বই ছিল না। অন্যদিকে চরম দ্বন্দ্ব ছিল চারদলীয় জোটে। যে কারণে হেরে গেছে তাদের প্রার্থী।

হালকা সিল পড়েছে সুতরাং আপত্তি করলেন। ঐটা আলাদা রাখা হলো। ইতিমধ্যে আর একটা বাতিল হয়ে গেল কালি ছড়িয়ে যাওয়ায়। প্রিজাইডিং অফিসার জানালেন এই কেন্দ্রের ২৬০৭ ভোটের মধ্যে ২০৯৪টি ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি ব্যালট নিয়ে আপত্তি থাকায় প্রিজাইডিং অফিসার লিখিত নির্দেশাবলী দেখিয়ে পোলিং এজেন্টদের সাথে একমত হলেন। ফেমা, রূপান্তর, আশা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একজন করে পর্যবেক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন। ১৬টি ব্যালট পাওয়া গেল তাতে কোনো সিল নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয় দলের একটি করে টেন্ডার ব্যালট পেল তাতে কোনো সিল নেই।

ফেমার পর্যবেক্ষক, রূপান্তরের পর্যবেক্ষকের সাথে ভোট গ্রহণ সম্পর্কে মত বিনিময় করছেন। তাদের মতামত জানতে চাইলে তারা বললেন, সারা খুলনাতে চমৎকার ভোট হয়েছে বলে সবাই বলছে। ভোট গণনা শেষ, পোলিং এজেন্টরা চলে গেছে। এ কেন্দ্রে চার দলীয় ঐক্যজোট প্রায় ২০০ ভোটে এগিয়ে আছে। ১১ দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ১টি করে ভোট পেয়েছে। প্যাকেট বাঁধা হচ্ছে। সব শেষে পোলিং অফিসারদের ১৭৫ টাকা করে দিচ্ছেন প্রিজাইডিং অফিসার। পুলিশের এসআই মিজান জানালেন, আমরা পাবো ৫০ টাকা করে। পুলিশ বাহিনী এ দেশে খুবই অবহেলিত। আমাদেরই সবচেয়ে বেশি খাটা-খাটনি করতে হয়। গত ৩ রাত ধরে দাঁড়ানো।

জেলা নির্বাচন অফিস : রাস্তার সম্মুখে বিডিআর, পুলিশ গাড়ি। জেলা নির্বাচন অফিসের সামনে অসংখ্য পুলিশ বিডিআর আনসার ও প্রিজাইডিং অফিসার। কাগজ দিয়ে নির্বাচন সামগ্রী ও ব্যালট বক্স জমা নিচ্ছে। নির্বাচন অফিসের কার্যালয় ভীষণ গরম। সবাই খুবই ব্যস্ত। সবাই ফলাফলের অপেক্ষায় আছে। এ পর্যন্ত ৪টি কেন্দ্রের ফলাফল এসেছে। আরো তিনটি এসেছে কিন্তু খোলা হয়নি। রাস্তায় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্নমুখী মিছিল আসা-যাওয়া করছে। জিন্দাবাদ, ধানের শীষ, জয়বাংলা বিভিন্ন রকম আওয়াজ অনেক দূর থেকেই সহজে ভেসে আসছে নিস্তব্ধ পরিবেশে। প্রভাতী রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদেশী পর্যবেক্ষকের গাড়ি ঢুকলো। এত ঘিঞ্জি এলাকাতে ফরাসি মহিলা চলে আসবে ভাবা যায় না। আবার দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি দূর থেকে মুচকি হেসে হাত নাড়লেন। গাড়ি থেকে নামতেই একদল পুরুষ/নারী ভোটার তাকে ঘিরে জটলা করছে এবং নানা অভিযোগ জানালো। এখানে অনেকেই তার কাছে এসে অভিযোগ করছে যে তারা ভোট দিতে এসে দেখে তাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। তাদের আগে কেউ এসে ভোট দিয়ে গেছে।

বিদেশী পর্যবেক্ষক ঢোকাতে প্রিজাইডিং অফিসার অনেকের টেন্ডার ব্যালট দ্রুত নিশ্চিত করলেন। সেই সুযোগে টেন্ডার ব্যালটে ভোট দিলেন আলমগীর। যাওয়ার সময় কৃতজ্ঞতার সাথে আঙুলের কালি দেখিয়ে সালাম দিয়ে কেন্দ্র ত্যাগ করলেন। গরিবের জন্য কিছু করেন, মূর্খ মানুষ, আমার ভোটটা দিয়ে দিছে আর একজন। এহন কি করবো কন। আবুল হোসেন, বয়স ৫৫ বছর। মাছের ব্যবসা করেন ৫নং ঘাটে। স্যার আমি ভোট দিমু কেমনে আমাগো লাইগা কিছু করেন। পর্যবেক্ষক দলের ড্রাইভার বললেন, আপনারা ভেতরে ছিলেন আমি এখান থেকে যা দেখলাম তা কল্পনাই করতে পারবেন না। ঐ যে নীল শার্ট পরা ছেলেটা। ১০-১২ জন মহিলারে জোগাড় করে বলেছে তোর এই নাম, তোর ঐ নাম, তোরা ধানের শীষে ভোট দিবি।

ইসলামাবাদ কমিউনিটি সেন্টারে ভোট গণনা শুরু হবে। বিভিন্ন আসনে বসার পাঁয়তারা চলছে। পোলিং অফিসার বলছেন এভাবে বসেন ওভাবে বসেন। সবার সামনে ব্যালট বাক্স। আব্দুল হাই সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বলেন, যদি সারা বাংলাদেশে এই সেন্টারের মত ভোট হয় আর যদি কেউ বলে ভোট ফেয়ার হয়নি তাহলে সে মানুষের বাচ্চা না। ব্যালট পেপার ঢালা হলো, গণনার কাজ শুরু হয়েছে।

আলী হায়দার আজম, খুলনা থেকে

চট্টগ্রামে পরাজয়ের আওয়ামী লীগের নেপথ্যে

চট্টগ্রামের ১৫টি আসনের ১৩টিতে বিএনপি'র জয় এবং ২টিতে আওয়ামী লীগের জয় সকল মহলের সকল সমীকরণ যেন পাল্টে দিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী লীগ আশা করেছিল ১০টি আসনে জিতবে। বিএনপি আশা করেছিল ১২টি আসনে জিতবে। বিএনপি তাদের আশাতীত সাফল্যে এবং আওয়ামী লীগ মাত্র দুটি আসনে জিতে ১৩টি আসন হারিয়ে হতবাক। চট্টগ্রামের সকল স্তরের নাগরিকের আলোচনায় এ বিষয়টিই কেবল উঠে আসছে। অপ্রত্যাশিত এ ফলাফলে বিস্মিত সাধারণ জনগণ।

চট্টগ্রাম-৪ এবং চট্টগ্রাম-৬ এই দুটি আসন যথাক্রমে ফটিকছড়ি এলাকায় রফিকুল আনোয়ার এবং রাউজান আসনে এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী আওয়ামী লীগের প্রার্থিতা নিয়ে বিজয়ী হয়। অন্য সবগুলো আসনেই বিএনপি জয়ী হয়েছে। এসবের পেছনে আওয়ামী লীগের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, প্রার্থী নির্বাচনে অদূরদর্শিতা এবং প্রচন্ড দলীয় কোন্দলকে দায়ী করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

গত ৫ বছরে আওয়ামী লীগের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের আশাবাদ ছিল সংখ্যালঘু ভোট এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাদের পক্ষে রায় দেবে। সেই আশাবাদ থেকে প্রার্থী নির্বাচনে প্রচণ্ড অদূরদর্শিতা, দলীয় কোন্দল বেড়ে যাওয়া এবং ভোট প্রার্থনা করে নির্বাচনী এলাকার দ্বারে দ্বারে যেতে গড়িমসি ক্ষমতা পেয়ে বেড়েছিল নেতাকর্মী দূরত্ব। আওয়ামী লীগের এ বিপর্যয়ের জন্য সেসব কারণ দায়ীত্ব বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল দাবি করেন।

চট্টগ্রামের নগর এলাকার ৮, ৯ ও ১০ আসনে ডা. আফসারুল আমিন ,এম এ মান্নান এবং এসএম আবুল কালাম আওয়ামী লীগের প্রার্থিতা দাবি করলেও তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের নিজেদের পক্ষে কাজ করাতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন দাবি মাঝারি পর্যায়ের কিছু নেতাকর্মীর। ফলে এর বিপরীতে বিএনপি'র তিন প্রার্থী তাদের সুফল ঘরে তুলেছেন। অন্যান্য কেন্দ্রগুলো ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যেকার কোন্দল তাদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলেও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং তৃণমূল পর্যায়ের নৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যর্থতা তাদের এ ভরাডুবির পেছনে দায়ী বলে বিশ্লেষক মহলের ধারণা। '৯৬-এর ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামে ৫টি আসনের ৪টিই হারিয়েছে এবার আওয়ামী লীগ। ১টি নতুন (চট্টগ্রাম-৬) আসন প্রাপ্তি প্রমাণ করেছে উপযুক্ত প্রার্থী এবং এলাকার গণসংযোগ এবং উন্নয়নমূলক কাজের ব্যর্থতাই অন্য আসনগুলো হারানোর পেছনে দায়ী। তবে নির্বাচন এলেই 'সংখ্যাগুরু' অভিধায় অবিহিত হতে হয় এদেশে জন্ম নেয়া একটি জনগোষ্ঠীকে— তাদের প্রতি প্রচন্ড অত্যাচার এবং অবহেলার কিছুটা দায় আওয়ামী লীগের বলে বিশ্লেষক মহলের ধারণা। প্রশাসনের পুরোপুরি ব্যর্থতা রয়েছে স্বল্প সংখ্যক সংখ্যালঘুর ভোট প্রদানে সক্ষম হওয়ার পেছনে। চট্টগ্রামের ১৫টি আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে এ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রার্থিতা নিয়ে চট্টগ্রাম-৯, চট্টগ্রাম-১০, চট্টগ্রাম-৫, চট্টগ্রাম-১১, চট্টগ্রাম-১২ এসব আসনে তুমুল দ্বন্দ্ব সকল নেতাকর্মীকে কাজে নামাতে পারেনি। দলীয় নেতৃবৃন্দও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হননি। সবকিছু মিলিয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দু'দলই চট্টগ্রামের নির্বাচনী ফলাফলে বিস্মিত।

চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**